৩১

কৃষিবিকাশ ও সবুজ বিপ্লব

প্রচলিত কথায় সবুজ বিপ্লব নামক ঘটনাটি ভারতের এক রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত। যে-ভারত ছিল খাদ্যের অভাবে চির-ক্লিষ্ট এক দেশ, যার ভাবমূর্তি ছিল ভিখারির, সে এক ধাক্কায় এমন এক দেশে পরিণত হল যে কিনা খাদ্যে স্বয়ংভর। এমনকী অচিরে সে খাদ্য-উৎপাদনে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারল। এই রূপান্তর ঘটল ভারতীয় কৃষিতে প্রধান প্রধান প্রযুক্তি-সংস্কারের পরিণতিতে, যা বিশেষ করে মধ্য-ষাটের সময় থেকে ঘটতে থাকে। যে 'নয়া কৃষি রণনীতি' প্রবর্তনের ফলে সবুজ বিপ্লব ঘটল, তার সূচনাকাল, এবং তার পিছনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাগুলি নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। কৃষির বৃদ্ধির ওপর, কৃষকদের বিভিন্ন শ্রেণির, বিশেষ করে গরিব চাষিদের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তনের ওপর, এবং বিভিন্ন সরকারের শ্রেণি-ভারসাম্যের ওপর এর অভিঘাত নিয়েও অনেক প্রাণবন্ত বিতর্ক হয়েছে। এখানে সবুজ বিপ্লবের যে-সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক বিবরণ দেওয়া হবে, তার মধ্যে সেই বিতর্কের কিছু আভাস অবশ্যই থাকবে।

একটা মত হল, 'নেহরু যুগে', অর্থাৎ স্বাধীনতার সময় থেকে ১৯৬৪ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত, ভারতে কৃষি ছিল অবহেলিত; তখন মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার; কৃষির প্রযুক্তিগত ভিত্তিটা নিয়ে তখন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। এই মতটা ক্রমশ পরিত্যক্ত হচ্ছে। নেহরু খুব ভাল করেই জানতেন যে তাঁর দ্রুত শিল্পায়নের স্বপ্ন সফল করতে হলে কৃষিতে উন্নতি ঘটানোর গুরুত্ব একেবারে কেন্দ্রিক। প্রথম পরিকল্পনাতেই কৃষিতে বিনিয়োগের যে-ছক করা হয়েছিল তা যে-কোনও মানেই যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। মোট বিনিয়োগের ৩১ শতাংশ ধার্য হয়েছিল কৃষি ও সেচের জন্য। কিন্তু শুধু প্রথম পরিকল্পনা নয়, পরের সমস্ত পরিকল্পনাতেও ওই অঙ্কটা ছিল ২০ থেকে ২৪ শতাংশের মধ্যে। সব জমানার ক্ষেত্রেই এ-কথা প্রযোজ্য। এ-কথা সত্যি যে প্রথম দুই পরিকল্পনাকালে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে, বিশেষ করে সমবায় কৃষির ভিত্তিতে, উৎপাদনের যে-বৃদ্ধি আশা করা গিয়েছিল, তা ছিল খুবই অতিরঞ্জিত। পরে প্রমাণ হয় যে ওই আশা ভুল বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার-প্রয়াসের পাশাপাশি নেহরু প্রথম থেকেই আধুনিক কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত ও বৈজ্ঞানিক পরিকাঠানো গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। নেহরুর সাধের 'আধুনিক ভারতের মন্দির'গুলির মধ্যে ইস্পাত কারখানা যেমন ছিল, তেমনি ছিল ভাকরা-নাঙ্গাল-এর মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেচ ও

বিদ্যুৎশক্তি প্রকল্প, বহু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার, সার কারখানা ইত্যাদি।

ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশের শেষ ও ষাটের প্রথম দিকে, যখন ভারতীয় পরিস্থিতিতে যেসব ভূমি সংস্কার করা সম্ভব হয়েছিল সেগুলি সর্বোচ্চ ফল দিতে আরম্ভ করল, যখন কৃষিজমির প্রসার বাড়িয়ে কৃষির বৃদ্ধি ঘটানোর সম্ভাবনা চরম সীমার দিকে এগোতে লাগল, তখন নেহরুর নজর অবধারিতভাবেই আরও প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান লাভের দিকে সরে গেল। (চিন বা জাপানের মতো দেশ, যারা আরও দূরপ্রসারী ভূমি সংস্কার করেছিল, তাদেরও কিন্তু প্রবৃদ্ধিহার বজায় রাখবার জন্য অবশেষে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নতি ঘটানোর পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল।) নেহরুর জীবৎকালেই তৃতীয় পরিকল্পনায় পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধার নিরিখে কয়েকটি বিশেষ এলাকার পনেরোটি জেলাকে নিবিড় বিকাশের জন্য বেছে নিয়ে নয়া কৃষি রণনীতি অনুযায়ী এক গুচ্ছ কর্মসূচি (নিবিড় কৃষি জেলা কর্মসূচি বা আই এ ডি পি) নিয়ে কাজে নামা হয়। প্রতি জেলায় একটি করে বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিই কয়েক বছর পরে সাধারণভাবে সর্বত্র প্রযুক্ত হয়। সবুজ বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক জি এস ভাল্লা বলেন:'

> সবুজ বিপ্লব, বা ভারতের প্রযুক্তিভিত্তিক গুণগত রূপান্তর ... তাঁর জীবৎকালে ঘটেনি, ঘটেছিল তাঁর প্রয়াণের অল্পকাল পরে। এই প্রযুক্তিভিত্তিক বিকাশের বনেদ কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবৎকালেই।

তবে, মধ্য-ষাট নাগাদ কতকগুলো দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা আর কতকগুলি তাৎক্ষণিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে কয়েকটি ক্রান্তিকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমাপতন ঘটে, আর তারই ফলে এক সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হয়। সেই সন্ধিক্ষণই ভারতকে নয়া কৃষি রণনীতির দিকে ঠেলে দেয়।

১৯৪৯ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে ভারতের কৃষি উৎপাদন বছরে প্রায় ৩ শতাংশ হারে বাড়ে, যা খুবই প্রশংসনীয়। তা সত্ত্বেও কিন্তু মধ্য-পঞ্চাশের সময় থেকেই খাদ্য-ঘাটতি চলতে থাকে, এবং মধ্য-ষাটে গিয়ে তা গভীর সংকটের রূপ নেয়। ষাটের শুরু থেকেই কৃষির প্রবৃদ্ধিহার থমকে যায়। স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ ঘটে। পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছরে যেখানে প্রতি শতে প্রতি বছর ১ শতাংশ বৃদ্ধি হত, সেখানে এই পর্বে তা ২.২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াল। মাথাপিছু আয় ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। তার ওপর পরিকল্পিত শিল্পায়নের জন্য বিশাল টাকা বিনিয়োগ করা হল (যার মাত্রা প্রত্যেক পরিকল্পনায় বেড়ে চলে)। এইসবের ফলে ভারতীয় কৃষির ওপর দীর্ঘমেয়াদি চাপ পড়ল। খাদ্যের চাহিদা এতটাই বাড়ল যে ভারতের বাজার তা পুরোপুরি মেটাতে পারল না। মধ্য-পঞ্চাশ থেকেই খাদ্যের দাম বাড়তে থাকে। খাদ্য-ঘাটতি মেটানো আর খাদ্যের দামে স্থিরতা আনার জন্য উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় খাদ্য আমদানি করতে হল। এর বিকল্প ছিল গ্রামাঞ্চল থেকে প্রচুর মানবীয় মূল্য দিয়ে ব্যাপক পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করা। এ-পথ ভারতের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ছিল না। রাশিয়া বা চিনের মতো দেশে সেটা সম্ভব হয়েছিল এইজন্যে যে সেখানে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ ছিল না। পি এল-৪৮০ কার্যসূচি অনুযায়ী আমেরিকা থেকে খাদ্য আমদানি করার

বিতর্কিত চুক্তিটি সই হয় ১৯৫৬ সালে। চুক্তির পর প্রথম বছরেই প্রায় তিরিশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। তার পর থেকে আমদানির পরিমাণ বাড়তেই থাকে। ১৯৬৩ তে ৪৫ লক্ষ টনেরও বেশি খাদ্য আমদানি করতে হয়।

এহেন পরিস্থিতিতে প্রথমে চিনের সঙ্গে (১৯৬২) তারপর পাকিস্তানের সঙ্গে (১৯৬৫) যুদ্ধ বাধল। ১৯৬৫-৬৬ তে পরপর দু'বার খরা হওয়ার দরুন কৃষি উৎপাদন কমল ১৭ শতাংশ, খাদ্য উৎপাদন কমল ২০ শতাংশে। খাদ্যের দাম হুহু করে বাড়ল। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮-র মধ্যে বছরে প্রায় ২০ শতাংশ করে বাড়ল। ১৯৬৬ সালে ভারত ২ কোটি টনেরও বেশি খাদ্যশস্য আমদানি করতে বাধ্য হল। এইরকম সংকটের মুহূর্তে, যখন দেশের অনেক জায়গা, বিশেষত বিহার আর উত্তর প্রদেশ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি, তখন আমেরিকা এই বলে ভয় দেখাল যে, সে ভারতকে খাদ্য রপ্তানি করার প্রতিশ্রুতি রাখবে না। ভারত-পাক যুদ্ধ, ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান, এবং প্যাঁচে ফেলে ভারতকে আমেরিকার পছন্দসই একপ্রস্থ অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করা, এইসব দিক ভেবেচিন্তে রাষ্ট্রপতি জনসন ঠিক করলেন ভারতকে এবার 'শায়েস্তা' করতে হবে। আর তাই যদি করতে হয়, তা হলে খাদ্যের জন্য আমেরিকার ওপর ভারতের অসহায় নির্ভরতাকে নিষ্ঠুরের মতো কাজে লাগাতে পারলেই তো কেল্লা ফতে!

এইরকম অবস্থায় সবার আগে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জন, বিশেষত খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জনই মধ্য-ষাটে ভারতের অর্থনৈতিক পলিসির— অর্থনৈতিক কেন বিদেশনীতির— লক্ষ্য হয়ে উঠল। তখনকার প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, তাঁর খাদ্যমন্ত্রী সি সুব্রমণিয়াম, এবং ইন্দিরা গাঁধী, যিনি শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্ত প্রধানমন্ত্রিত্ব-কালের পর প্রধানমন্ত্রী হলেন, এঁরা সকলেই ভারতীয় কৃষির উত্তরণের রণনীতির মৌলিক রূপান্তর সাধনের প্রক্রিয়াকে পূর্ণ মদত দিলেন ও তাকে গড়ে তুললেন। বিশ্ব ব্যাঙ্ক-নিয়োজিত বেল মিশন ওই রণনীতির সুপারিশ করল, আমেরিকাও তার অনুকূলে চাপ দিল। তবে এঁরা 'খোলা দরজাই খুলতে চাইছিলেন', কারণ ভারতের মধ্যেই ওই পরিবর্তনের সপক্ষে এক জোরালো অভিমত গড়ে উঠছিল। যেসব এলাকায় সেচের নিশ্চিতি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা আছে সেইসব জায়গায় নিবিড়ভাবে কাজ আরম্ভ হল, বিবিধ ক্রান্তিক উপাদান সেখানে প্রয়োগ করা হল। যেমন, উচ্চ ফলনশীল বীজ (এইচ ওয়াই ভি: উচ্চ-ফলনশীল এই মেক্সিকান বামন-গমের আবিষ্কারটি ভারতের পরিবেশে অত্যন্ত উপযোগী ও সময়োপযোগী এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলে প্রতিপন্ন হয়), রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, ট্র্যাক্টর, পাম্প প্রভৃতি সমেত নানান কৃষি-যন্ত্রপাতি, মৃত্তিকা-পরীক্ষার ব্যবস্থা, কৃষি-শিক্ষা কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ। এইভাবে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি, অর্থাৎ মোট কর্ষিত জমির প্রায় ১০ শতাংশকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বেছে নিয়ে সেইখানে ওই সমগ্র কর্মসূচির যাবতীয় সুযোগসুবিধা ঢেলে দেওয়া হল।

কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যরূপে বাড়ল। কৃষিতে বিনিয়োজিত প্রাতিষ্ঠানিক অর্থের পরিমাণ ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে দ্বিগুণ হল। 'কৃষিপণ্য মূল্য কমিশন' স্থাপিত হল ১৯৬৫ সালে। চেষ্টা করা হল কৃষকরা যাতে নির্বাহযোগ্য লাভজনক মূল্যে

তাদের পণ্যের একটা নিয়মিত বাজার পায়। সরকারি বিনিয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, পণ্যের লাভজনক মূল্য, অল্প খরচে নতুন প্রযুক্তি লাভ, এইসবের ফলে কৃষকদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের লাভজনকতা বেড়ে উঠল। ফলে কৃষিতে মোট মূলধন গঠনের পরিমাণ আগের তুলনায় দ্রুত বাড়তে লাগল। এর একটা প্রতিফলন পাওয়া গেল মোট সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধিতে। প্রাক-সবুজ বিপ্লব যুগে ওই পরিমাণ ছিল বছরে ১০ লক্ষ হেক্টর; সত্তরের দশকে সেটা বেড়ে হল ২৫ লক্ষ। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে বৈদ্যুতিক ও ডিজেল পাম্প সেটের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২১ হাজার থেকে বেড়ে হল ২৪ লক্ষ; নলকূপের সংখ্যা ৯০ হাজার থেকে বেড়ে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার, ট্র্যাক্টরের সংখ্যা ৩০ হাজার থেকে বেড়ে ১ লক্ষ ৪০ হাজার। ওই পর্বে রাসায়নিক সার, নাইট্রোজেন, ফসফরাস আর পট্যাশিয়ামের ব্যবহার ৩ লক্ষ ৬ হাজার মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হল ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। এই বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই হল দ্বিতীয় অর্ধে।

অচিরেই এই রণনীতির সুফল দেখতে পাওয়া গেল। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩৫ শতাংশ বাড়ল। এদিকে, ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৭১-৭২-এর মধ্যে মোট খাদ্য উৎপাদন ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন থেকে বেড়ে হল ১ কোটি ১২ লক্ষ টন। হিসেব করলে দাঁড়ায় মাথা পিছু শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি। নিট খাদ্য আমদানির পরিমাণ কমল। ১৯৬৬ সালে ছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ, ১৯৭০ সালে হল ৩৬ লক্ষ টন। একই পর্বে খাদ্যের প্রাপ্যতা ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টন থেকে বেড়ে হল ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টন। হিসেব করে দেখা গেছে যে, 'নয়া কৃষি রণনীতি গ্রহণ না করলে ভারতকে প্রতি বছর অন্তত ৮০ থেকে ১০০ লক্ষ টন গম আমদানি করতে হত, যার খরচ ৬০ কোটি থেকে ৮০ কোটি ডলার।'[৭] খাদ্যের প্রাপ্যতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৭৮-এ তা হয় ১১ কোটি ২৫ হাজার টন, ১৯৮৪-তে ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ টন। অবশেষে ভারতের 'ভিখারি' ভাবমূর্তি বদলায়। আশির দশকে ভারত ৩ কোটি টনেরও বেশি সংরক্ষিত খাদ্য-ভাণ্ডার নিয়ে শুধু যে খাদ্যে স্বয়ংভর হল তাই নয়, এমনকী আগেকার ঋণ মেটানোর জন্য খাদ্য রপ্তানি করতে শুরু করে দিল। এমনকী খাদ্য-ঘাটতিযুক্ত অন্যান্য দেশেও খাদ্য রপ্তানি করতে লাগল। এইরকম স্বস্তিদায়ক অবস্থা ছিল বলেই ১৯৮৭ আর ১৯৮৮-র ব্যাপক খরা পরিস্থিতিতেও বাইরে থেকে বিরাট কোনও সাহায্য না-নিয়েই ভারত অবস্থাটা সামলে নিতে পারল। অথচ মধ্য-ষাটে এর বিপরীতটা ঘটেছিল। ৯০-এর শেষাশেষি ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয় প্রায় ২০ কোটি টন। ১৯৫০-৫১ সালে ওই অঙ্কটা ছিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রায় ৩ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারকে (২.১%) ছাপিয়ে গেছে।

সবুজ বিপ্লব রণনীতির একটা বড় অভিঘাত এই যে কৃষি ফলন বাড়িয়ে তুলে তা পুনরায় ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের উচ্চ প্রবৃদ্ধিহার ধরে রাখতে পেরেছে। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্বে ভারতের গড় প্রবৃদ্ধিহার ছিল বছরে ২.৭ শতাংশ। প্রাক-সবুজ বিপ্লব পর্বে এই বৃদ্ধির পেছনে দুটি জিনিস কাজ করেছিল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা ৫১ ভাগ এসেছিল কৃষি-এলাকা প্রসারণের মধ্যে দিয়ে (যা ১.৬১ শতাংশ হারে বাড়ে), আর ৪৯ শতাংশ এসেছিল ফলন বাড়িয়ে (যা বছরে ১.৫ শতাংশ হারে বাড়ে)। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধিহার

বজায় রাখার কাজে এলাকা-প্রসারণ আর ফলন দুয়েরই গুরুত্ব ছিল প্রায় তুলামূল্য। কিন্তু কৃষি-এলাকার প্রসারণ সম্পৃক্তি-মাত্রায় পৌঁছে যাবার পর, প্রবৃদ্ধির ওই হার বজায় রাখতে হলে ফলন দ্রুত বাড়ানো ছাড়া আর কোনও পথ রইল না। আর এই কাজটাই সার্থকভাবে করল সবুজ বিপ্লবের রণনীতি। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৮৯-৯০-এর মধ্যে যে-বৃদ্ধি হয় তার শতকরা ৮০ ভাগই হয় একর পিছু ফলন-বৃদ্ধির দরুন (বছরে ২.৫ শতাংশ হারে)। আর মাত্র ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মূলে ছিল এলাকা-প্রসারণ (বছরে ০.২৬ শতাংশ)। বাস্তবিক, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উৎপাদনে যে বৃদ্ধি ঘটেছে, তার প্রায় সমস্তটাই ফলন বৃদ্ধির দরুন ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ কর্ষিত জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, এমনকী কমেছে।

এ-কথাও মানতে হবে যে, কৃষি-প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা ছাড়াও সবুজ বিপ্লবের আরেকটা ক্রান্তিক অভিঘাত হয়েছিল এই যে এর ফলে খাদ্যশস্যের বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণটাও অতি দ্রুত বেড়ে ওঠে। এই দিকটার ওপর বোধহয় যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়নি। নয়া কৃষি রণনীতির দরুন কেন বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ এত বেড়ে উঠল তার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। খাদ্য উৎপাদনের এই নতুন পথ প্রথম যেসব জায়গায় খুলে যায় সেগুলি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের এমন কয়েকটি অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চল যেখানে খাদ্য-ব্যবহারের হারটা আগে থেকেই বেশ উচ্চ ছিল। সুতরাং বাড়তি উৎপাদনের বেশ বড় একটা অংশই বাজারে ছাড়া হত। উৎপাদনের প্রতি একক পিছু নিয়োজিত শ্রমের ব্যবহার কমার লক্ষণ দেখা দেওয়ায়, গ্রামাঞ্চল থেকে বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত গড়ে ওঠে। সে-উদ্বৃত্তের পরিমাণ এতটাই যে শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য উৎপাদনের যে-অংশটা সরিয়ে রাখা হত তার অনুপাতটা কমে আসে। আর, যেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে মূলত ফলন বৃদ্ধিরই দৌলতে, এলাকা-প্রসারণের দৌলতে নয়, তাই উৎপাদনের একক পিছু বীজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য খাদ্যশস্যের প্রয়োজনটাও কমে যায়।

সবুজ বিপ্লবের দৌলতে এই যে উদ্বৃত্ত বিপণন করা হল, এরই ফলে (মোট সর্বভারতীয় প্রবৃদ্ধি-হারের কোনও অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে নয়) সরকারের পক্ষে দেশের মধ্যে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বিরাট খাদ্য-ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হল। দ্রুত শিল্পায়ন, শহরেও সাধারণভাবে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, এবং কিছুদিন অন্তর অন্তর কতকগুলি অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়া প্রভৃতি কারণে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে এবং সে-চাহিদা দেশের ভেতর থেকেই মেটানো সম্ভব হয়। তার জন্য পি এল-৪৮০ বা অন্য কোনও আমদানির ওপর নির্ভরতা কেটে যাওয়ায় যে-মুক্তি এল সেটা ভারতের আত্মনির্ভর স্বাধীন বিকাশের পথে এক মস্ত পদক্ষেপ।

তবে রূপায়ণের একেবারে আদিলগ্ন থেকেই নয়া কৃষি রণনীতি সম্পর্কে নানান সন্দেহ জেগে উঠতে থাকে। একটা যুক্তি ফিরে ফিরেই দেওয়া হয় যে, সবুজ বিপ্লবে সেইসব অঞ্চলেই সম্বল কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে যেগুলি ইতিমধ্যেই কিছু সুবিধা পেয়েছে। এর ফলে দেশে আঞ্চলিক বৈষম্য তো আরও প্রকট হয়ে উঠবে। স্পষ্টতই এইসব আশঙ্কা দূর করার একমাত্র পথ হল সবুজ বিপ্লবকে আরও প্রসারিত করা। সর্বতোভাবে সবুজ বিপ্লবের

বিরোধিতা করা তার পথ নয়। জি এস ভাল্লা' প্রমুখ পণ্ডিতরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তোলার বদলে সবুজ বিপ্লব বরং ক্রমে ক্রমে দেশের ব্যাপক অংশে ছড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে সমৃদ্ধিই নিয়ে এসেছে। সবুজ বিপ্লবের প্রথম পর্বে, অর্থাৎ ১৯৬২-৬৫ থেকে ১৯৭০-৭৩ সালের মধ্যে সারা ভারতে যৌগিক হারে বার্ষিক ২.০৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা গিয়েছিল। কিন্তু মূল বৃদ্ধিটা হয়েছিল পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, হরিয়ানায় আর পশ্চিম উত্তর প্রদেশে। এই জায়গাগুলি জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বিকশিত হয়েছিল। পঞ্জাবের বৃদ্ধি-হার ছিল অভূতপূর্ব, ৬.৬৩ শতাংশ। পরের পর্বে, অর্থাৎ ১৯৭০-৭৩ থেকে ১৯৮০-৮৩ সালের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রযুক্তি গম থেকে ধানেও প্রসারিত হয় এবং সবুজ বিপ্লব দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে পূর্ব উত্তর প্রদেশে, অন্ধ্রপ্রদেশে (প্রধানত তার উপকূলবর্তী অঞ্চলে), কর্নাটকের কিছু কিছু অংশে আর তামিলনাড়ু প্রভৃতি স্থানে। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল এবার সর্বভারতীয় ২.৩৮ শতাংশের চেয়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে। সবুজ বিপ্লবের তৃতীয় এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিক পর্বটি হল ১৯৮০-৮৩ থেকে ১৯৯২-৯৫। এই পর্বে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সবুজ বিপ্লব এবার ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব ভারতের এতদিনকার কমবৃদ্ধিযুক্ত এলাকাগুলোতে, যথা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম ও ওড়িশা। এইসব জায়গায় বার্ষিক ৫.৩৯ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়, যা অভূতপূর্ব। অন্যান্য অঞ্চল, যথা দক্ষিণাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যও দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। বস্তুত, এই প্রথম দক্ষিণাঞ্চল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় বেশি প্রবৃদ্ধিহার অর্জন করতে পারল। তৃতীয় পর্বের শেষ নাগাদ রাজ্যে রাজ্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির হারের সঙ্গে (হেক্টর পিছু) ফলন-হারের মাত্রার পার্থক্যটা পূর্ববর্তী দশকগুলির তুলনায় অনেকটাই নেমে এল। এই পর্বে সারা ভারতে কৃষি উৎপাদনের সামগ্রিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধিহার অভূতপূর্বরূপে ত্বরান্বিত হয়ে বার্ষিক ৩.৪ শতাংশে পৌঁছোয়। কিন্তু শুধু তাই নয়, এই বৃদ্ধির ধরনটা ছিল অনেক ছড়ানো, যার ফলে গ্রামের সমৃদ্ধিও অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রসারিত হয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্য অনেক কমে।

সবুজ বিপ্লবের প্রথম দিকে, বিশেষ করে সত্তরের দশকে একটা মত বেশ প্রবল হয়ে ওঠে যে ওই বিপ্লব গ্রামাঞ্চলে শ্রেণি-মেরুকরণ ঘটাচ্ছে। এই যুক্তি দেওয়া হয় যে ছোট চাষি, প্রজা ইত্যাদিদের অংশত খরচের খাতায় লিখে দিয়ে ধনী চাষি আর পুঁজিপতি খামার-মালিকরা শক্তি বাড়াচ্ছে। ছোট চাষি, প্রজা ইত্যাদিরা আধুনিক চাষের উপকরণের খরচ জোগাতে অপারগ, তাই তারা ক্রমে ভূমিহীনদের দলে গিয়ে ভিড়ছে। অর্থাৎ একটা বি-কৃষকীকরণের প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেছে। তার ওপর, চাষবাসে যন্ত্রীকরণ ঘটায় শ্রমিকরা কর্মহীন হয়ে পড়ছে, বেকারত্ব বাড়ছে, কৃষি শ্রমিকদের মজুরি কমছে। অন্য কথায়, সব মিলিয়ে গ্রামের গরিবরা এক ধরনের আপেক্ষিক নির্ধনীকরণের, কোনও কোনও ক্ষেত্রে চরম নির্ধনীকরণের প্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছে, ফলে কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। 'সবুজ বিপ্লব লাল বিপ্লবে পরিণত হবে', এই ছিল শেষ-ষাট ও প্রথম-সত্তরের জনপ্রিয় স্লোগান।

পরবর্তী ঘটনাগুলি এবং সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে এসব সন্দেহ অমূলক ছিল। ঠিক যেমন, আঞ্চলিক বৈষম্য সংক্রান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বও অমূলক ছিল। যেদিন থেকে নয়া কৃষি রণনীতির সূত্রপাত হয়েছে, সেদিন থেকেই খেয়াল রাখা হয়েছিল যে গরিব চাষিরা যাতে নতুন প্রযুক্তি কাজে লাগাবার সুযোগ পায় তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে হবে। (এটা অবশ্য লক্ষ করতে হবে যে গরিবদের ওপর এই নতুন রণনীতির যে-কুপ্রভাব পড়তে পারে, সে-বিষয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ তখনই যেসব বিপদ সংকেত দিয়েছিলেন তা খানিকটা অতি-আতঙ্কবাদী হলেও হয়তো তারই দরুন এ-বিষয়ে প্রথম দিকে সচেতনতা জাগে এবং ওইরকম ভয়ানক কিছু যাতে না-ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়)। ওই রণনীতি যখন জোর কদমে এগোতে আরম্ভ করেছে তার একটু পরেই ষাটের দশকের শেষদিকে ও সত্তরে ইন্দিরা গাঁধীর 'গরিবি হঠাও' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আবার সুসংগঠিত রূপে চেষ্টা করা হয় গ্রামের গরিব, ছোট চাষি আর ভূমিহীনদের কাছে পৌঁছোবার জন্য। একের পর এক অনেকগুলো কর্মসূচি নেওয়া হয়, যথা গ্রামীণ কর্ম প্রকল্প (আর ডবলিউ পি), ক্ষুদ্র কৃষক বিকাশ সংস্থা (এস এফ ডি এ), প্রান্তিক চাষি ও কৃষি শ্রমিক কর্মসূচি (এম এফ এ এল), গ্রামীণ আশু কর্মসংস্থান যোজনা (সি এস আর ই), মহারাষ্ট্রে কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প (এ জি এস) ইত্যাদি। এর মধ্যে এস এফ ডি এ এবং এম এফ এ এল অনুসারে ১০ লক্ষ ছোট চাষি আর ৫ লক্ষাধিক প্রান্তিক চাষিকে চিহ্নিত করে অল্প, মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়। ছোট এবং প্রান্তিক চাষিরা তাদের বিনিয়োগের জন্য যে-টাকা ধার করবে তার যথাক্রমে ২৫ ও ৩৩.৩ শতাংশ সরকার থেকে ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সমবায় সংস্থা, জমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, কৃষি পুনর্বিনিয়োগ নিগম প্রভৃতি সংস্থা মারফত কৃষি ঋণ যেভাবে সুলভ হয়ে ওঠে তার সুফল পায় লক্ষ লক্ষ গরিব চাষি। একটা বিশেষ উদ্‌যোগ নেওয়া হয় যাতে এই ঋণের সুবিধা আরও গরিব অংশের হাতে গিয়ে পৌঁছোয়। সে-প্রয়াস রীতিমতো সফল হয়েছিল।

যত ত্রুটিবিচ্যুতিই থাক, এসব কর্মসূচির ক্রমসঞ্চিত একটা প্রভাব পড়ে। এতটাই পড়ে যে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ রাজকৃষ্ণ ১৯৭৯ সালে এই প্রতিবেদন দেন যে 'প্রতি একক জমি পিছু ছোট চাষিদের শ্রেণি যে-পরিমাণ উৎপাদনী সম্পদ ও উপাদানের অধিকারী তা বড় চাষিদের তুলনায় বেশি।'" ছোট চাষিরা, যাদের সক্রিয় জোতের আয়তন ৫ একর বা তার কম, তারা মোট কর্ষিত জমির মাত্র ২১ শতাংশ চাষ করে, অথচ নিট সেচসেবিত জমিতে তাদের ভাগ হল ৩১.৪ শতাংশ, মোট ব্যবহৃত সারের ৩২ শতাংশ, এবং মোট কৃষি ঋণের ৩৩ শতাংশ। নয়া সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি কেবল যে ছোট-বড় নিরপেক্ষ বলেই প্রমাণিত হল তাই নয়, আকারের সঙ্গে যেন তার উৎপাদনশীলতার এক বিপরীত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয়। বড় কৃষকদের তুলনায় প্রতি একক জমি পিছু অপেক্ষাকৃত বেশি উপকরণ জোগান দিয়ে ছোট চাষিরা মোট জমির ২১ শতাংশে মোট কৃষি উৎপাদনের ২৬ শতাংশ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়।

সবুজ বিপ্লব ছোট চাষিকে ভূমিহীনদের দলে তো ঠেলে দেয়নি, বরং তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। নতুন প্রযুক্তি, উন্নত বীজ এবং অন্যান্য কৃষি উপাদান সুলভ হয়ে ওঠায়

ছোট কৃষকদের পক্ষে অবস্থাটা যেন অপেক্ষাকৃত সুস্থিত হয়ে উঠল। বিপদে পড়লেই আর বড় চাষির কাছে জমি বিক্রি করবার জন্য ছুটতে হত না তাকে। জি এস ভাল্লা এবং জি কে চাদা' প্রমুখের গবেষণা থেকে এ-ঘটনাটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বস্তুত, মোট জোত-সংখ্যার মধ্যে এবং মোট কর্ষিত জমির মধ্যে ২৫ একর কিংবা আরও বেশি পরিমাণ জমিওয়ালা জোতের অনুপাতটা স্বাধীনতার পর থেকেই একটানা কমছে। আর প্রান্তিক চাষি, ছোট চাষি ও মাঝারি ভূস্বামীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জোতের সংখ্যা ও জমির পরিমাণটা স্থিতিশীল রয়েছে, হয়তো একটু বেড়েছে। সবুজ বিপ্লব ঘটুক আর না-ঘটুক, ভারত মোটের ওপর ছোট ও মধ্য-চাষি-প্রধান দেশ হিসেবেই রয়ে গেছে। ১৯৮০-৮১ সালে ২৫ একর বা তার চেয়ে কম জমির জোত নিয়ে কাজ-করা চাষির সংখ্যা ছিল মোট জোতের শতকরা প্রায় ৯৮। তারাই মোট জমির ৭৭.২ শতাংশ জমি চাষ করত। ওই সময় ১০ একর বা তার চেয়ে কম জমির জোত নিয়ে কাজ-করা চাষির সংখ্যা ছিল মোট জোতের শতকরা প্রায় ৮৮.৩। তারাই মোট জমির ৪৭.৫ শতাংশ জমি চাষ করত।

বোধহয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কেবল সেইসব প্রজা আর বর্গাদার, যাদের স্বত্ব সুরক্ষিত ছিল না। যেসব এলাকায় সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল সেখানে জমির খাজনা আর দর বাড়ার দরুন এরা অসুবিধায় পড়ে গেল। তা ছাড়া এইসব অঞ্চলে মালিকরা চাইত অরক্ষিত প্রজাদের দূর করে আধুনিক সরঞ্জাম আর ভাড়া-করা শ্রমিকদের দিয়ে নিজ-চাষ চালু করতে। তবে জমি-মালিক ছোট চাষিদেরই মতো 'সুরক্ষিত' প্রজা আর বর্গাদাররাও নতুন প্রযুক্তির সুফল ভোগ করত।

সবুজ বিপ্লবে শ্রমিকদের বদলে যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় গ্রামে কর্মহীনতা বাড়বে, এ-আশঙ্কা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। সবুজ বিপ্লব চালু হওয়ার খুব অল্পদিনের মধ্যেই ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পঞ্জাবে খেত খামার ঘুরে দেখেন ভল্‌ফ লাদেজিন্স্কি (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে মিত্রশক্তির দখলদারি পর্বে ইনিই জেনারেল ম্যাকআর্থারকে ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনার কাজে পরামর্শ দেন এবং তারপর তাইওয়ান, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স্ আর ভারতের ভূমি সংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন)। তিনি জানান যে নতুন প্রযুক্তির প্রসার ঘটার পর 'ঠিকে শ্রমিকদের চাহিদা বেড়েছে, মজুরিও বেড়েছে আর ভূমিহীন শ্রমিকদের অবস্থা আগের তুলনায় কিছুটা ভাল হয়েছে।" ট্র্যাক্টর-চাষের 'বলি' যদি কেউ হয়ে থাকে তো সে বলদরা, শ্রমিকরা নয়। আরেকটা আশঙ্কা ছিল যে ট্র্যাক্টর-চাষের পরবর্তী পর্বে যখন যদৃচ্ছভাবে ব্যাপক আকারে বড় বড় যন্ত্রের প্রবর্তন ঘটবে, যথা কম্বাইন হার্ভেস্টর, থ্রেশার প্রভৃতি, তখন শ্রমিকরা কর্মচ্যুত হবে। সে-ঘটনাটাও দেশের কোনও জায়গাতেই যে লক্ষণীয় মাত্রায় ঘটেছে তা নয়। যেমন, পঞ্জাবে ১৯৬১ থেকে ১৯৮১-র মধ্যে কৃষিশ্রমিকদের সংখ্যা তিনগুণ হয়েছে বলে ধরা হয়, অথচ ওই সময়ে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা কমে গেছে। শ্রমিকদের বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য বাইরের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রাজ্য, যথা পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে ব্যাপক অভিবাসন ঘটাতে হয়।

আরেকটা যুক্তি দেওয়া হয় যে সবুজ বিপ্লবের পরের দিকে কৃষিতে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির

হার কমে আসে, যা কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিরই অঙ্গ। অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধির কর্মনিয়োগ-স্থিতিস্থাপকতা কমে আসে। এক্ষেত্রে অভিযোগটা কিন্তু এ নয় যে শ্রমিকদের সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা নিচ্ছে যন্ত্র; অভিযোগ এই যে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তি কাজ তৈরি হচ্ছে না।

তা ছাড়া একের পর এক অঞ্চল জুড়ে সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে কৃষিতে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি, শহরে ও গ্রামে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের সুযোগ বেড়েছে। কারণ কৃষি-শিল্প বিকশিত হয়, ব্যাবসা-বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ ঘটে, কৃষিজ পণ্য এবং সার, কীটনাশক প্রভৃতি গুদামজাত করার ব্যবস্থা দ্রুত বিকশিত হয়, পরিবহণ শিল্প ব্যাপকভাবে পরিবর্ধিত হয়, খামারের জন্য বহু রকমের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপাদান তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে, ট্রাক, ট্র্যাক্টর, বৈদ্যুতিক ও ডিজেল পাম্প ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সারাইয়ের চাহিদা বিপুলভাবে বাড়ে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উপকূলবর্তী অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি সব জায়গাতেই এই ঘটনা ঘটেছে। ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত কৃষি-যন্ত্র ও সরঞ্জামই দেশে তৈরি হতে থাকে, ফলে কৃষির যন্ত্রীকরণ ঘটায় শহরে কারখানায় শ্রমিক-নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়। তা ছাড়া, সবুজ বিপ্লবের দরুন গ্রামের আয় বাড়ার ফলে রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, দর্জি, তাঁতি প্রভৃতি পেশার চাহিদাও বাড়ে। সেইসঙ্গে বাড়ে শহরের কারখানায় তৈরি দীর্ঘ-ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের চাহিদা, যথা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো, হাতঘড়ি, সাইকেল, পাখা, টেলিভিশন, কাচার মেশিন, মোটর সাইকেল, সেলাই কল থেকে শুরু করে গাড়ি ও শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র পর্যন্ত। এর মধ্যে কোনও কোনও পণ্যের চাহিদা শহরের তুলনায় গ্রামেই বেশি বাড়ে, ফলে প্রস্তুতকারকরাও গ্রামের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হয়। শহরে নতুন কর্মনিয়োগের পথ খুলে দেওয়ার ব্যাপারেও এর ভূমিকা নগণ্য নয়। এটা খুবই লক্ষণীয় যে পঞ্জাবে ১৯৭১ থেকে ১৯৮১-র মধ্যে শহরে কর্মনিয়োগ বাড়ে চমকপ্রদ ৫০ শতকরা হারে। এর মধ্যে দিয়ে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রের ওপর কৃষিক্ষেত্রের অভিঘাত অংশত প্রতিফলিত হয়।

তবে জনসংখ্যা যে-হারে বাড়ছিল তার কর্মনিয়োগের প্রয়োজন সবুজ বিপ্লবের মারফত মেটানো সম্ভব ছিল না। এই বর্ধমান জনসংখ্যার একটা বড় অংশেরই বাস ছিল গ্রামে। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য অল্প-মেয়াদি ও দীর্ঘ-মেয়াদি আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। এখানেও সবুজ বিপ্লবের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কৃষি-উৎপাদনে নতুন দিগন্ত খুলে যাওয়ায় প্রচুর উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সংগৃহীত হল এবং তার সাহায্যে এমন সব দারিদ্র্য-প্রশমক কর্মসূচি রূপায়িত করা সম্ভব হল যা থেকে অনেক কর্ম-সংস্থান হল, বিশেষ করে চাষবাসের দিক থেকে পিছিয়ে-থাকা এলাকায়। কৃষি-বিশেষজ্ঞ ও পলিসি-প্রণেতা সি এইচ হনুমন্ত রাও বলেছিলেন:'

> মধ্য-ষাট দশকে ওই ধরনের কর্মসূচি থেকে প্রায় ২ কোটি শ্রম-দিবসের কর্মসংস্থান করা গিয়েছিল, আর ১৯৮৮-৮৯-তে সারা দেশে সব মিলিয়ে সেই সংখ্যাটা ছিল ৮৫ কোটি। সবুজ বিপ্লব-পরবর্তী যুগে কর্মসংস্থানে মোট যত ঘাটতি হয়, মনে হয় তার

আর্ধেকই পূরণ হয় এইসব কর্মসংস্থান কর্মসূচি থেকে আর সমন্বিত গ্রাম বিকাশ কর্মসূচি (আই আর ডি পি) জনিত আয় থেকে। ... দেশের মধ্যে থেকে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলেই ওইসব কর্মসূচি চালানো সম্ভব হয়েছিল।

তবে সবুজ বিপ্লব সত্যিই গ্রামাঞ্চলের অসাম্যকে বাড়িয়ে তুলল। গরিবরাও অনাপেক্ষিক বিচারে কিছুটা লাভবান হল বটে, কিন্তু সে তুলনায় তাদের সম্পন্ন প্রতিবেশীদের লাভ হল অনেক বেশি। কিন্তু এর বদলে যদি এমন এক রণনীতি প্রয়োগ করা হত যা অনেক বেশি 'সমতাবাদী' ও 'রাজনৈতিক অর্থে শোভন,' অথচ যে-গরিবরা ইতিমধ্যেই বাঁচার লড়াইয়ে পর্যুদস্ত হয়ে রয়েছে তাদের অবস্থাকে তা আরও খারাপ করে তুলত, তা হলে সেটা অন্তত নিষ্ঠুর কাজ হত। নয়া কৃষি রণনীতির অভিঘাত সম্বন্ধে একেবারে প্রাথমিক যেসব প্রতিবেদন পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায়, অসাম্য নিশ্চয়ই বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু ছোট চাষি আর ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক সমেত গরিবরাও কিছু সুফল পেয়েছিল। ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ড্যানিয়েল থর্নার উপকূলবর্তী অন্ধ্র, তামিলনাড়ুর থানজাভুর, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অংশ সরেজমিনে তদন্ত করেন।[৮] লাদেজিনস্কিও ১৯৬৯ সালে পঞ্জাব ঘুরে দেখেন। তাঁদের প্রতিবেদন থেকে ওই কথা প্রমাণিত হয়। যেসব অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব ছড়াল সেখানে কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বাড়ল। পঞ্জাবের মতো উচ্চ বৃদ্ধিহার-যুক্ত জায়গায় সে-মজুরি আরও বাড়তে পারত যদি-না বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মতো নিম্ন-মজুরি অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা সেখানে দলে দলে ধেয়ে আসত। কিন্তু কেবল চলে-আসা শ্রমিকরাই যে অনেক বর্ধিত হারে মজুরির সুবিধা পেল তা নয়, তারা যে-রাজ্য থেকে এসেছিল সেখানেও মজুরি বাড়তে লাগল। মধ্য-সত্তর থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের মধ্যে কৃষিতে মজুরি-বৈষম্য কমতে আরম্ভ করে। তার অন্যতম কারণ হল পিছিয়ে-থাকা রাজ্য থেকে সবুজ বিপ্লব অঞ্চলে শ্রমিকদের প্রব্রজন।

সংক্ষেপে, খাদ্যের লভ্যতা, খাদ্যের দাম আপেক্ষিকভাবে কমে-আসা (এই খাতেই গরিব মানুষের খরচ হয় সবচেয়ে বেশি), কৃষি ও কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে কর্ম সৃষ্টি, মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সবুজ বিপ্লব গ্রামের দারিদ্র্য-মাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যে-অঞ্চলে কৃষিতে উন্নতি হয়েছে, অর্থাৎ সবুজ বিপ্লব ঘটেছে, গ্রাম ভারতের সেই অঞ্চলে দারিদ্র্য-সীমার নীচের মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসে। এ দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটা এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। দেশের এক বিরাট প্রবৃদ্ধিমান অংশে এই ঘটনাটা এখন ঘটে চলেছে। ভারতীয় জনসমষ্টির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই এখনও (দুই-তৃতীয়াংশ) কৃষির ওপরে নির্ভরশীল। এ-অবস্থায় দারিদ্র্য-বিনাশী ব্যবস্থা রূপে সবুজ বিপ্লব জাতীয় বিকাশকে ছড়িয়ে দেওয়ার গুরুত্ব যে সমধিক তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। (সাম্প্রতিক কালে সেচ ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার পিছনে সরকারি বিনিয়োগের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে, কারণ কৃষির উন্নতিকে দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ওটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ)।

সুতরাং সবুজ বিপ্লব গ্রামাঞ্চলে 'লাল বিপ্লবে'র জন্ম দেয়নি। কৃষকদের প্রতিবাদ, এমনকী

কৃষকদের জঙ্গিয়ানা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কৃষিব্যবস্থার একেবারে নিম্নতম স্তর থেকে গোটা ব্যবস্থাটাকে উৎখাত করার জন্য এসব আন্দোলন হয়নি; এগুলি সবই হল ছোট, মাঝারি ও বড় কৃষকদের আন্দোলন, যারা এই ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত, যারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের দাম আরও বাড়িয়ে এবং রাষ্ট্রীয় ভরতুকি মারফত উৎপাদনের খরচ আরও কমিয়ে আরও বেশি আদায় করতে চায় (অধ্যায় ৩২ দেখুন)। বাস্তবিক, বছরের পর বছর ধরে ওইসব অংশের রাজনৈতিক ক্ষমতা এত বেড়েছে যে সরকার অনেক সময়েই তাদের দাবির সঙ্গে আপস করতে কমবেশি বাধ্য হয়েছে। অনেক সময়েই সেসব আপস অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুচিত ছিল। অধিকাংশ রাজ্যেই কৃষির উদ্দেশ্যে যে-বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তা দেওয়া হয় বিদ্যুৎ-উৎপাদনের খরচের চেয়েও কম দামে, কোনও কোনও রাজ্যে, যেমন পঞ্জাবে তো বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় বিনা পয়সায়! এইসব ঘটনা দীর্ঘমেয়াদি বিচারে, কৃষি সমেত ভারতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক স্বাস্থ্যহানি করেছে (অধ্যায় ২৮, ২৯ ও ৩২ দেখুন)।

ইদানীং কালে একটা বড় প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা হল পরিবেশের অবক্ষয় ও কৃষিতে উন্নতির দীর্ঘমেয়াদি নির্বাহযোগ্যতার প্রশ্ন। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ওপর কী কী কুপ্রভাব পড়েছে, পঞ্জাবের মতো যেসব এলাকা ওই ধরনের পদার্থ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছে তাদের ফলনহারে কীভাবে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে, সেসব ভালভাবেই নথিবদ্ধ হয়েছে। সবুজ বিপ্লবের অনেক এলাকাতেই সেচের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ ভূমিজল টেনে নেওয়া হয়, কিন্তু মাটির নীচের জলভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণ জল পুনঃসঞ্চালিত করা হয় না। এটা পরিবেশগত দিক থেকে মোটেই নির্বাহযোগ্য নয়। তবে এ-সমস্যার যে কোনও সহজ সমাধান আছে তা কিন্তু নয়। বর্তমান প্রযুক্তিতে কৃষি-বৃদ্ধি ঘটানোর দরুন যেমন পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তেমনি কৃষি-বৃদ্ধি না-ঘটলে আবার অবধারিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও অন্য ধরনের পরিবেশ-সমস্যা দেখা দেবে। এরকম যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ভারতের বাস্তু-সাম্যে (ইকলজি) যে-অবনতি ঘটেছে তার প্রধান কারণ হল কৃষিকার্যকে প্রান্তিক ও উপ-প্রান্তিক শুখা জমিতে টেনে নিয়ে যাওয়া। আরেকটা কারণ হল অরণ্যবিনাশ। এটাও লক্ষ করা হয়েছে যে 'সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চাষের জমির বিস্তারণ ও অরণ্যবিনাশ সেইসব জায়গাতেই যেন বেশি ঘটছে যেখানে ফলন-বাড়ানোর প্রযুক্তি শ্লথ গতিতে এগিয়েছে।'[৯] যে-কারণে গরিবরা বাধ্য হয়েই প্রান্তিক জমির ওপর, গ্রামের মাঠঘাটের ওপর এবং জঙ্গলের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রসিদ্ধ কৃষি-বিশেষজ্ঞ এম এস স্বামীনাথন[১০] হিসেব করে দেখিয়েছেন, গম ও চালের সবুজ বিপ্লবের আগের হেক্টর-পিছু ফলনহারে যদি বর্তমানে উৎপাদিত খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হত, তা হলে বাড়তি ৮ কোটি হেক্টর জমি লাগত, অর্থাৎ তার জন্য বিদ্যমান কৃষিজমি শতকরা ৬৬ ভাগ বাড়াতে হত— যা অবাস্তব। স্পষ্টতই, অরণ্য-রক্ষার কাজে ফলন-বাড়ানোর প্রযুক্তি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে যে-পরিস্থিতিতে ভারতের অরণ্য-আচ্ছাদন বিপজ্জনকভাবে ক্ষয়ে গেছে।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে বিদ্যমান আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তিতে কৃষিতে বৃদ্ধি ঘটানোর অন্ধ বিরোধিতা করলে তা নির্বাহযোগ্য হবে না, তাতে হিতে বিপরীত হবে। তবে, কৃষকদের

শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগ নেবার সময় এসে গেছে। তাদের বোঝাতে হবে যে অত্যধিক পরিমাণে ও বেঠিক কায়দায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা ঠিক না, সেচের ক্ষতিকর পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া ঠিক না। জৈব-বৈচিত্র্য বজায় রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করার সময় চিরাচরিত পদ্ধতিতে বাস্তু-সাম্য রক্ষা করার প্রক্রিয়াগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল করতে হবে। এ-অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা পথ হল নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিশেষ করে জৈব-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। একদা ভারত সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পেরেছিল। আজকের এই বিকাশমান জগতের পরিপ্রেক্ষিতেও ভারতকে যদি আত্মনির্ভরতা বজায় রেখে নির্বাহযোগ্য প্রবৃদ্ধিহার অর্জন করতে হয়, তা হলে গবেষণার এই একেবারে সম্মুখসারিতে কাজ করার ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

স্বাধী

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে
হয়ে-যাওয়া কৃষক আন্দো
আগে থেকেই চলে আসি
আন্দোলন এবং আশির দ
হয়েছে। এরই মাঝে মা
১৯৫৭-৫৮ সালে মধ্যপ্র
মহারাষ্ট্রের ধুলিয়ায় ভীল
থেকে পরিচালিত ওয়র্লি
১৯৭০ সালে এস এস পি
করে। সেচ প্রকল্পের খ
উন্নততর দাম পাওয়া ই
পি আই তার প্রথম দেশ
করে ১৯৬৮ সালে, মো
শুরু হল, ভারতের অন্য
কৃষিঘটিত ও সামাজিক
অব্যবহিত পরের কৃষ
সমস্যাগুলিই ছিল প্রধান
কৃষি-ঘটিত পরিবর্তনের
সংস্কারের জন্য সংগ্রাম
অন্তর্ভুক্ত। স্থানাভাবের
না। এখানে কেবল ক
শান্ত আন্দোলনগুলি নি

স্বাধীনতা যে আসন্ন,
অনুমান করে ১৯৪৫-
সংখ্যা অনেক বেড়ে যা
আন্দোলন দেশভাগের